বাংলাদেশের প্রান্তিক নারীদের শিক্ষা সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

গৌতম রায়

বাংলাদেশের শিক্ষায় পুরুষদের তুলনায় নারীরা নানা দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের বা নারীশিক্ষার্থীদের অবস্থার তুলনামূলক উন্নতি ঘটলেও সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় নারীরা এখনো অনেক পিছনে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে নানা উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে এবং উদ্যোগগুলোর ফলাফল ধীরগতিতে হলেও দৃশ্যমান হচ্ছে। নারী-পুরুষের যে সমতার কথা বলা হয়, আশা করা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে সেই সমতা হয়ত আগামী ১৫-২০ বছরে অর্জিত হবে; যদিও ১৫-২০ বছর সময় কম নয় এবং এ সময়টুকুতে নারীদের দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে নারী বা নারীশিক্ষার্থীরা যে জায়গাগুলোতে এগিয়ে রয়েছে তার একটি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েশিশুদের ভর্তির হার। সরকারি হিসেব থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ে বর্তমানে ভর্তির হার শতকরা ৯১ ভাগ, যার মধ্যে মেয়েশিশুরা ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে (যথাক্রমে ৯৪.৭ শতাংশ ও ৮৭.৮ শতাংশ)[১]। গত কয়েক বছরের এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফল থেকেও দেখা যায়, সব শিক্ষাবোর্ডেই মেয়েশিক্ষার্থীরা ছেলেদের তুলনায় ভালো কিংবা সমান ফলাফল করছে। এই একই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কখনো ভর্তি হয় নি এমন শিশুদের হিসেব থেকে দেখা যায়, সারাদেশে ১২ শতাংশেরও বেশি শিশু রয়েছে, যারা কখনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় নি এবং এক্ষেত্রে ছেলেদের হার মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি[২]। সব মিলিয়ে মেয়েশিক্ষার্থীরা অন্তত বিদ্যালয় প্রবেশগম্যতার জায়গাটিতে বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। চিত্র ১-এ বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েশিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধির একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে। এতে দেখা যায়, ১৯৯৮ সালে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েশিশুদের ভর্তির হার ছিল ৭৮.৫ শতাংশ, সেখানে ২০০৭ সালে এই হার বেড়ে প্রায় ৯৫ শতাংশে পৌঁছেছে। প্রতি বছর ১.৮ শতাংশ হারে এই হার বাড়ছে। অবশ্য এটি সারা দেশের গড় অবস্থার চিত্র। এমন অনেক এলাকা আছে, যেখানে মেয়েদের ভর্তির হার ৫০ শতাংশও ছাড়ায় নি।

সরকারি নানা উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওসমূহ তাদের শিক্ষাবিষয়ক কার্যাবলিতে মূলত দরিদ্র ও ঝরে পড়া শিশুদের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করছে, যেখানে মেয়েশিশুরা বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত এসব বিদ্যালয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ মেয়েশিশু ভর্তি করা হয়, যা অধিক সংখ্যক মেয়েশিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শিক্ষকদের দিক দিয়ে বিবেচনা করলেও দেখা যায়, শিক্ষার প্রতিটি স্তরে নারীশিক্ষকদের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা অনুসারে দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় নারী ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত হবে ৬০:৪০। এ সিদ্ধান্ত প্রতি বছর অধিক সংখ্যক নারীশিক্ষক নিয়োগ দেয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই এ অনুপাতে পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের প্রায় শতভাগ শিক্ষকই নেয়া হচ্ছে নারী। এছাড়া চাকুরির অন্যান্য সেক্টরেও নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। শিক্ষায় এই নারী-পুরুষ বৈষম্য কমানো বা পুরুষদের তুলনায় নারীদের অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি আলোচনায় আসে

[1] Directorate of Primary Education (2007). *School survey report 2007 of second primary education development programme (PEDP-II).* Dhaka: Government of Bangladesh.

[2] Nath SR and Chowdhury AMR (2009). *The state of primary education in Bangladesh: Progress made, challenges remained.* Dhaka: Campaign for Popular Education.

গত শতকের আশির দশক থেকে। এমডিজি ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক শিক্ষা ঘোষণায় নারীশিক্ষার বিষয়টি এ সময়েই সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে[৩]। ইউনেস্কোও তাদের নানা কর্মকাণ্ডে নারীশিক্ষার প্রতি অগ্রাধিকারের কথা বলেছে[৪]। বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি নানা স্বপ্রণোদিত উদ্যোগ যেমন দেশের নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে, তেমনি আন্তর্জাতিক এসব ঘোষণাও সরকারকে নারীবান্ধব শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষায় অধিক সংখ্যক মেয়েশিশুর অংশগ্রহণের বিষয়টি এখন প্রাথমিকের গণ্ডি ছাড়িয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায়ও বিস্তৃত হয়েছে।

চিত্র ১ : বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েশিশুর ভর্তির হার[৫]

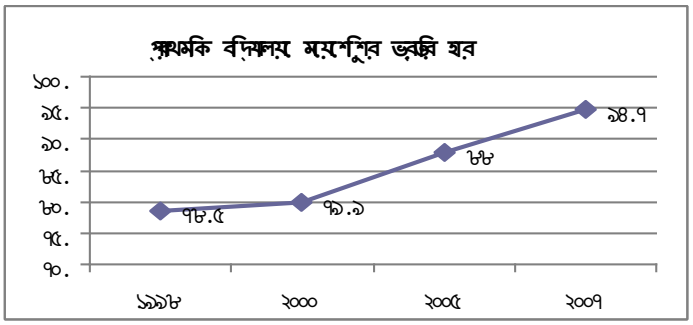

এই লেখায় বাংলাদেশের প্রান্তিক নারীদের শিক্ষার সমস্যা ও উত্তরণের কিছু উপায় নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রান্তিকতার সংজ্ঞা মূলত প্রেক্ষাপট-নির্ভর হলেও বঞ্চনা ও সামাজিক সুবিধার অপ্রতুলতার কথা চিন্তা করলে বাংলাদেশের নারীরা সার্বিক অর্থেই প্রান্তিকতার শিকার। প্রান্তিকতার ধরন এবং বৈচিত্র্য সময় ও স্থানভেদে বিভিন্ন রকম হলেও বর্তমান লেখায় প্রান্তিক নারী বলতে মূলত তাদেরই চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা মেয়ে বা নারী হিসেবে নানা দিক দিয়ে বঞ্চনা ও সুবিধাহীনতার শিকার। এ সংজ্ঞানুসারে হাওরাঞ্চলের নারীরা যেমন প্রান্তিক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে, তেমনি ঢাকা শহরের মেয়ে-পথশিশুরাও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যারা সমাজ বা রাষ্ট্রের নানা কর্মকাণ্ডে মূলস্রোতের বাইরে, যাদের জন্য সমাজ বা রাষ্ট্রপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাসমূহ অপ্রতুল কিংবা নেই এবং এ কারণে যারা নিজেদের বিকশিত করতে সমর্থ হচ্ছে না, তাদের এই লেখায় প্রান্তিক বলে ধরে নেয়া হয়েছে। এর যৌক্তিকতা আরো যে, এসব নারী সামাজিক, লৈঙ্গিক, বৈষয়িক কিংবা আর্থিক অসুবিধার কারণে নিজেরা বিকাশের স্রোতে শামিল হতে পারলেও তা ধরে রাখতে পারে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তারা স্বাভাবিক প্রান্তিকতার মধ্যে না-পড়লেও পরোক্ষভাবে তাদের প্রান্তিকতার শিকার হতেই হয়; এবং এ চিন্তা থেকে বিচার করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে ছেলেদের তুলনায় সার্বিকভাবে মেয়েরা এখনো বেশি প্রান্তিকতার শিকার।

বাংলাদেশের প্রান্তিক নারীদের নিয়ে গবেষণা বা লেখালেখি তুলনামূলকভাবে কম। যে গবেষণাগুলো হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রান্তিক নারীদের আলাদা অংশ (segment) হিসেবে বিবেচনা করা হয় নি; বরং প্রান্তিক এলাকায় থাকার কারণে নারী বা মেয়েশিশুদের অবস্থা সেসব গবেষণায় উঠে এসেছে। ফলে এসব গবেষণার তথ্য থেকে একটি ফোকাস্ড গ্রুপ হিসেবে প্রান্তিক নারীদের শিক্ষার সার্বিক অবস্থা, তাদের সমস্যার ধরন কিংবা সমাধানের পথগুলো চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু সার্বিক অবস্থা বোঝা না-গেলেও তাদের সমস্যা সম্পর্কে বেশ কিছু ধারণা পাওয়া যায়। শিক্ষার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায়, চা বাগান, হাওর, বস্তি, চর ও উপকূলীয় এবং আদিবাসীঅধ্যুষিত এলাকার মেয়েশিশু ও নারী এবং যৌনকর্মীদের সন্তানরা ভয়াবহভাবে প্রান্তিকতার শিকার।

---

[3] WCEFA (1990). *World conference on Education for All: Meeting learning needs.* Jomtien, Paris: UNESCO.
[4] UNESCO (2000). *The Dakar framework of action.* Paris: UNESCO.
[5] CAMPE (1999). *Hope not complacency: state of primary education in Bangladesh 1999.* Education Watch 1999. Dhaka: Campaign for Popular Education and University Press Limited; CAMPE (2001). *A question of quality: state of primary education in Bangladesh. Volume I Major findings: a synthesis.* Education Watch 2000. Dhaka: Campaign for Popular Education and University Press Limited; CAMPE (2005). *Quality with equity- the primary education agenda.* Education Watch 2003/4. Dhaka: Campaign for Popular Education; and Directorate of Primary Education (2007). *School survey report 2007 of second primary education development programme (PEDP-II).* Dhaka: Government of Bangladesh.

চিত্র ২ : বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না-পারা বা বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা চা বাগানের শিশুদের হার[৬]

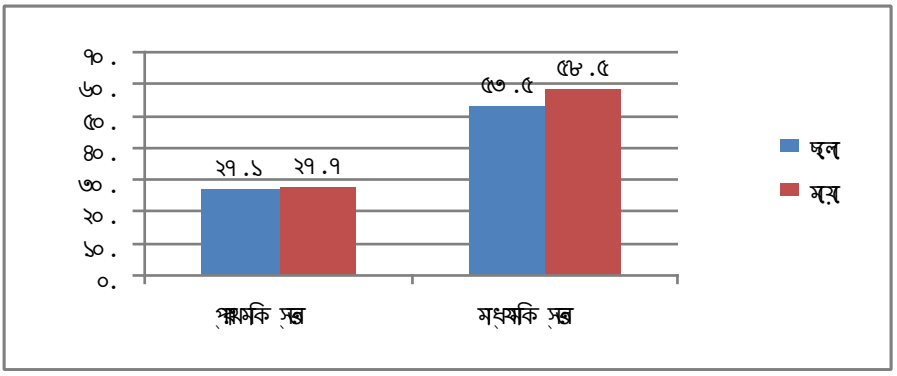

বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকা এবং উত্তরাঞ্চলে কিছু কিছু চা বাগান থাকলেও অধিকাংশ চা বাগানই অবস্থিত মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সিলেট জেলায়। এসব চা বাগান স্থাপিত হয়েছে ব্রিটিশ শাসনামলে এবং বাগানের শ্রমিকদের অধিকাংশই আদিবাসী। সাম্প্রতিককালে বাঙালি শ্রমিকের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চা বাগানগুলোতে যারা বাস করে, তাদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ খুবই কম এবং মেয়েদের সুযোগ আরো কম। চিত্র ২ থেকে দেখা যাচ্ছে, চা বাগান এলাকায় বসবাসকারী প্রায় ২৮ ভাগ মেয়েশিশু পড়ালেখার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না। এই হার ছেলেদের প্রায় সমান হলেও মাধ্যমিক স্তরে ছেলেদের চেয়ে প্রায় পাঁচ শতাংশ বেশি মেয়েশিশু বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না। বিদ্যালয় গমনের ক্ষেত্রে চা বাগান এলাকার ছেলে ও মেয়েদের মধ্যকার পার্থক্য প্রাথমিক স্তরে কম হলেও মাধ্যমিক স্তরে তা বাড়তে থাকে (চিত্র ৩)। বিশেষত বয়স যত বাড়ে, মেয়েদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হারও তত বেশি বাড়তে থাকে।

চিত্র ৩ : বয়স অনুসারে চা বাগান এলাকার ছেলে ও মেয়েদের ভর্তির হার[৭]

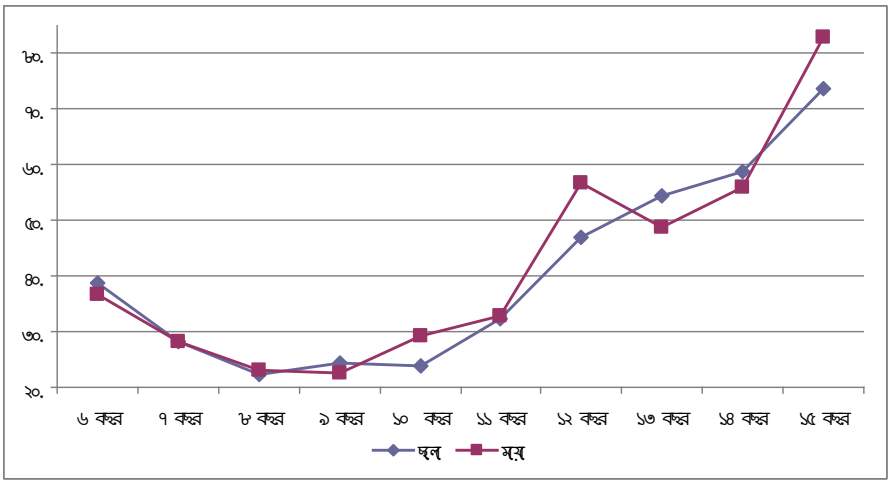

চা বাগান এলাকায় শিক্ষার নিম্নহারের অন্যতম কারণ হচ্ছে শিক্ষা বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও পিতামাতার অসচেতনতা। তাছাড়া এলাকাগুলো শহরের বাইরে হওয়ায় এবং যাতায়াতের অপ্রতুলতার কারণে সেখানে বিদ্যালয়ের সংখ্যাও খুবই কম। অনেক চা বাগান রয়েছে যেখানে কোনো ধরনের বিদ্যালয় নেই। ফলে সেসব বাগানের শিশুরা পড়ালেখার যাবতীয়

[6] Nath SR, Yasmin RN & Shahjamal MM (2005). *Out of school children in the tea gardens and ethnic minority communities.* Dhaka: Brac Research and Evaluation Division

[7] Nath SR, Yasmin RN & Shahjamal MM (2005). *Out of school children in the tea gardens and ethnic minority communities.* Dhaka: Brac Research and Evaluation Division

আয়োজন থেকে বঞ্চিত। একেকটি চা বাগানের আয়তন যেহেতু বিশাল হয়ে থাকে এবং অনেক চা বাগান যেহেতু পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত, সুতরাং অভিভাবকেরা তাদের ছোটো ছোটো সন্তানকে বাগানের বাইরের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহী হয় না। চা বাগানে বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে বাগান-মালিকদের অনুমতি লাগে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাগানের মালিকরা তাদের বাগানে বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে খুব একটা উৎসাহী হন না[৮]। এমনকি স্থানীয় এনজিও এসব এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দিলেও তা বাস্তবায়ন করা যায় না মালিকপক্ষের অনাগ্রহের কারণে, যদিও দিন দিন এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। বর্তমানে বেশ কিছু চা বাগান এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও এসব এলাকায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই বললেই চলে। চা বাগানের কেউ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে পার্শ্ববর্তী এলাকায় গিয়ে পড়তে হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই চা বাগানের শিশুদের, বিশেষত মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ খুবই কম।

চা বাগান এলাকার মতো একই চিত্র দেখা যায় আদিবাসীঅধ্যুষিত এলাকাগুলোয়। বাংলাদেশের অনেক এলাকাতেই আদিবাসী গোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে, যাদের সমতল ভূমি ও পার্বত্য এলাকার আদিবাসী হিসেবে ভাগ করা যায়। সারণি **১** থেকে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষায় গমনের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। একমাত্র সমতল ভূমির আদিবাসীদের মধ্যে মেয়েদের বিদ্যালয়ে না-যাওয়ার হার ছেলেদের চেয়ে কম হলেও বাদবাকি সব ক্ষেত্রেই মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ছেলেদের চেয়ে বেশি। বিশেষত মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকায় এই পার্থক্য খুবই বেশি।

সারণি ১ : এলাকা ও বয়স অনুসারে আদিবাসী শিশুদের বিদ্যালয়ের বাইরে থাকার হার

এলাকা	**৬-১০ বছর**		**১১-১৫ বছর**	
	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
সমতল ভূমি	৮.৪	৫.২	২৯.২	৩১.৪
চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা	১২.৫	১৪.৭	২৫.৬	৩৭.৮

[৮] মৌলভীবাজার ও সিলেটের বেশ কিছু চা বাগান এলাকার বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে এই বিষয়গুলো জানা গেছে।

আদিবাসীদের মধ্যেও সবার অবস্থা সমান নয়। চাকমা, গারো, ত্রিপুরা এবং মারমাদের শিক্ষার হার অন্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর তুলনায় বেশি। আদিবাসীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম বড়ো প্রতিবন্ধকতা হলো ভাষা ও যোগাযোগ মাধ্যম। তাদের নিজস্ব ভাষা থাকা সত্ত্বেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাদের বাংলা মাধ্যম ব্যবহার করে পড়ালেখা করতে হয় এবং ফলে অনেক আদিবাসী শিশু পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে যাতায়াত দুর্গম এবং সেখানে বিদ্যালয়ের পরিমাণও স্বাভাবিকের তুলনায় কম। ফলে আদিবাসী শিশুরা পড়ালেখার সুবিধা থেকে অনেকটাই বঞ্চিত। পাহাড়ের দুর্গম এলাকায় আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বেশ কিছু জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও কাজ করলেও মাধ্যমিক শিক্ষা সেখানে একেবারেই অপ্রতুল।

হাওর এলাকা আরেকটি বিশেষ অঞ্চল, যেখানকার মানুষ পড়ালেখার নানা ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। মূলত সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোনা এলাকায় দেশের অধিকাংশ হাওর অবস্থিত এবং এসব হাওর এলাকার মানুষজন বছরের অধিকাংশ সময় পানিবন্দি অবস্থায় বাস করে। বর্ষাকালে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম নৌকা হলেও শীতকালে শুকনো মৌসুমে এসব এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতে প্রচণ্ড কষ্ট করতে হয় যার প্রভাব পড়ে তাদের শিক্ষার ওপর। হাওর এলাকায় যেহেতু একেকটি গ্রাম একেকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, তাই কোনো গ্রামে বিদ্যালয় না-থাকলে সেই গ্রামের শিক্ষার্থীদের অন্য গ্রামে গিয়ে পড়ালেখা করা সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া অধিকাংশ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। গড়ে তিন-চারটি গ্রামে হয়ত একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরো কম। হাওর এলাকার বাসিন্দারা শুকনো মৌসুমে একফসলি চাষে ব্যস্ত থাকে এবং ফসল লাগানো থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত খুব বেশি হলে তিন মাস সময় পাওয়া যায়। এই একটি ফসলের ওপর যেহেতু তাদের সারা বছরের জীবিকার সংস্থান হয়, ফলে এ সময়টায় শিশুসহ সবাইকে চাষের কাজে মনোযোগ দিতে হয়। তাছাড়া প্রতি বছর ভাঙনের কারণে স্কুলঘর ধ্বংস কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ালেখা ব্যাহত হওয়ার বিষয়গুলো তো রয়েছেই। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলে এবং পিতামাতার আগ্রহ থাকলে মেয়েরা সেখানে বড়োজোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগটুকু পায়, যে সুযোগ মাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রে খুবই কম। যাতায়াতের সুযোগের অপ্রতুলতা, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সামাজিক কারণে অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের অন্য গ্রামে অবস্থিত বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে পড়ালেখা করাতে চান না। তদুপরি আর্থিক অনটন এবং তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়ার প্রবণতা তো রয়েছেই।

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বস্তির শিশুরা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি অবহেলিত, যদিও তাদের একটি বিশাল অংশ খোদ রাজধানীতে বসবাস করে। বস্তিতে বসবাসকারী শিশুদের সাথে পথশিশুদের সম্পৃক্ততা খুব নিবিড়, কারণ যেসব পথশিশুকে রাজধানী বা বড়ো শহরগুলোতে দেখা যায়, তাদের অনেকেই বস্তিতে বসবাস করে। অপরদিকে বস্তিতে বাস করে কিন্তু পথশিশু নয়, এমন শিশুও প্রচুর রয়েছে। এক জরিপ থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের বস্তিগুলোতে ১৮ বছরের কমবয়সী প্রায় তিন লাখ ৮০ হাজার শিশু বসবাস করে, যারা মোটামুটি সব ধরনের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত এবং এদের প্রায় ৫৫ শতাংশের বাস রাজধানী ঢাকায়। পথশিশুদের ৭৬ শতাংশ ছেলে ও ২৬ শতাংশ মেয়ে। এক গবেষণা থেকে দেখা যায়, তিন-চতুর্থাংশ পথশিশু জীবনের কোনো না কোনো সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন করলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাদের গমনের হার খুবই সীমিত। মাত্র ৪.৩ শতাংশ শিশু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গমন করেছে[৯]। মেয়েশিশুদের শিক্ষার হার ছেলেদের তুলনায় কম এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। অন্যদিকে সার্বিকভাবে বস্তিতে বসবাসকারী মাত্র ৫৯.৪ শতাংশ মেয়েশিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়, যাদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে পারে। যারা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে পারে তাদের ৮৪.৫ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যায়[১০]। বস্তি এলাকায় শিক্ষার এই নিম্নহারের অন্যতম কারণ হচ্ছে, সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সেখানে খুবই কম। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্য বড়ো শহরগুলোতে বস্তি এলাকায় বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেও এই সুযোগ সব বস্তির জন্য সমান নয়। ভাসমান ও ছোটো বস্তিতে শিক্ষার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম। বস্তিতে বসবাসকারীদের মধ্যে যাদের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো, তাদের অনেকের সন্তান পার্শ্ববর্তী কোনো বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করলেও সার্বিকভাবে সেই সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। তাছাড়া সেখানকার পারিপার্শ্বিকতা ও ঘিঞ্জি এলাকায় পড়াশোনা করার পর্যাপ্ত সুযোগ না-থাকায় অনেকে পড়ালেখার প্রতি আগ্রহীও হয় না। এদের মধ্যেও বিয়ের বয়স হওয়ার আগেই মেয়েদের বিয়ে দেয়ার প্রবণতা

[9] Khan NR & Hossain MA (2011). *Street children and their livelihood in Dhaka city* (unpublished report). Dhaka: Plan Bangladesh.

[10] BBS and UNICEF (2007). *Bangladesh Multiple Indicator Cluster Survey 2006,* Final Report. Volume 1: Technical Report. Dhaka: BBS and UNICEF.

লক্ষণীয়। এসব কারণে বস্তি এলাকার বিশেষত মেয়েদের পড়ালেখার অবস্থা খুবই করুণ।

অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর মধ্যে বেদে বা যৌনকর্মীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য একেবারেই অপ্রতুল। এছাড়া দলিতদের নিয়েও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। এসব প্রান্তিক গোষ্ঠীর সাথে বর্তমানে কিছু এনজিও কাজ করলেও সার্বিকভাবে এসব গোষ্ঠী নিয়ে তথ্য বা গবেষণা প্রতিবেদন খুব কম পাওয়া যায়। এক গবেষণা থেকে দেখা গেছে, বেদে গোষ্ঠীর মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ কখনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় নি। দুই শতাংশেরও কম বেদেশিশুর প্রাথমিক শিক্ষা রয়েছে[১১]। এদের মধ্যে কত শতাংশ মেয়ে, কিংবা মেয়েরা কেন বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, সে সম্পর্কিত গবেষণামূলক তথ্য পাওয়া যায় না। ধারণা করা যায়, যেহেতু বেদে জাতি বছরের বিভিন্ন সময় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, সুতরাং তারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার সুযোগগুলো গ্রহণ করতে পারে না। তাছাড়া শিক্ষার প্রতি অনীহা এবং পেশাগত কারণেও তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের যৌনকর্মীদের নিয়ে বেশ কিছু এনজিও কাজ করলেও তাদের শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক অবস্থার ওপর গবেষণা প্রতিবেদন বিরল। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে দেখা গেছে, যৌনকর্মীদের শিশুদের মাত্র ৫১ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। মূলত সামাজিক কারণেই যৌনকর্মীদের সন্তানরা তাদের এলাকার বাইরে থাকা বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না। প্রথমত, সাধারণ মানুষের একটি বিরাট অংশ চায় না যৌনকর্মীদের সন্তানরা তাদের সন্তানদের সঙ্গে একত্রে পড়ালেখা করুক। সামাজিকভাবে নানা বাধা আসে। দ্বিতীয়ত, যৌনকর্মীরাও অনেক সময় এসব সামাজিক বাধা দেখে তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহী হয় না। যৌনকর্মীদের ছেলেসন্তানদের কেউ কেউ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়লেও মেয়েদের অনেকেই পূর্বতনদের পেশাকে এ বয়স থেকেই নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। তাছাড়া যেহেতু যৌনকর্মীদের মেয়েদের অন্যরকম চোখে দেখা হয়, সুতরাং তারাও একটু বড়ো হওয়ার পর বিদ্যালয়ে যেতে আগ্রহী হয় না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যৌনকর্মীরা যে এলাকায় বসবাস করে সেখানে কোনো সরকারি বিদ্যালয় নেই। যে ৫১ শতাংশ শিশু বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে, তাদের অধিকাংশ অর্থাৎ ৬৭ শতাংশ শিশুই সেই এলাকায় কর্মরত এনজিও-পরিচালিত বিদ্যালয়ে পড়ে[১২]।

বাংলাদেশে প্রান্তিকতার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে প্রতিবন্ধী শিশু, বিশেষত প্রতিবন্ধী মেয়েশিশু, যারা সারা দেশেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও শিক্ষার সুযোগ থেকে এমনভাবে বঞ্চিত যে তাদের সহজেই প্রান্তিকতার আওতায় ফেলা যায়। বাংলাদেশে কত শতাংশ শিশু স্বল্প বা তীব্র কিংবা শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধিতায় ভুগছে, সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য না-থাকলেও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে ধারণা করা যায় যে, সারা দেশে ৪৫,৬৮০ জন শিশু স্বল্পমাত্রার প্রতিবন্ধিতায় (mild disabilities) ভুগছে, যাদের ৪৩.৪ শতাংশ মেয়ে[১৩]। প্রতিবন্ধিতা চিহ্নিত করার সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা হলো, নানা সামাজিক বাধা। এই ভয়ে পিতামাতা তাদের সন্তানদের বাইরের মানুষের কাছে প্রতিবন্ধী হিসেবে পরিচয় দিতে চান না। তাছাড়া দেশের বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুর বিশেষায়িত শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থা নেই। সাম্প্রতিককালে এ বিষয়টি প্রাথমিক শিক্ষায় বেশ গুরুত্ব পেলেও সেটি মূলত অবকাঠামোগত স্তরেই রয়ে গেছে। প্রতিবন্ধী শিশুর কথা মাথায় রেখে বিদ্যালয় ভবনে ঢালু সিঁড়ির ব্যবস্থা করা বা ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ উপকরণও সরবরাহ করা হলেও যে পদ্ধতিতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার ব্যবস্থা করা উচিত, সে পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েই গেছে। শিক্ষকদেরও এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নেই। ফলে অনানুষ্ঠানিক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, এসব কারণে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসার হার যেমন তুলনামূলকভাবে কম, তেমনি তাদের ঝরে পড়ার হারও বেশি। বিশেষত প্রতিবন্ধী মেয়েশিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে পুরোপুরি উপেক্ষিত।

উপরের আলোচনায় মূলত প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি বেশি করে এসেছে। এতে দেখা যাচ্ছে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুরা নানা কারণে বিদ্যালয়ের পড়ালেখা থেকে বঞ্চিত এবং মেয়েশিশুরা আরো বেশি বঞ্চিত। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য তথ্য নেই বললেই চলে। তবে ধারণা করা যায়, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশেষত মেয়েশিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এখনো স্বপ্ন হিসেবেই রয়ে গেছে।

---

[11] Maksud AKM (2006). *Action Research for human development in Beday (river gypsy) community.* Dhaka: Research Initiative Bangladesh.

[12] Nasreen M & Tate S (2007). *Social inclusion: gender and equity in education SWAPS in South Asia, Bangladesh case study.* Khathmandu: UNICEF Regional Office for South Asia.

[13] Directorate of Primary Education (2006). *Baseline report of second primary education development programme (PEDP II).* Dhaka: Government of Bangladesh.

প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মেয়েশিক্ষার্থীদের কম অভিগম্যতার বিষয়টি ইতোমধ্যে কিছুটা আলোচিত হয়েছে। কিছুদিন আগ পর্যন্ত মেয়েশিশুদের বিদ্যালয়ে না-যাওয়ার কারণ হিসেবে মূলত অভিভাবকের আর্থিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করা হতো। সাম্প্রতিক সময়ের গবেষণা থেকে দেখা গেছে, মেয়েশিশুদের প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ে না-যাওয়ার কারণ বহুবিধ[১৪]। কারণগুলো আবার পরস্পরসম্পর্কিত এবং একটি আরেকটির ওপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে সরকারিভাবে শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়স হচ্ছে ছয় বছর। প্রাথমিক শিক্ষার আইন অনুসারে সকল পিতামাতা এই বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে বাধ্য। কিন্তু গবেষণা থেকে দেখা যায়, যে সমস্ত শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যায় না, তাদের পিতামাতা মনে করেন, বিদ্যালয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই বয়সটি খুবই কম। বিশেষত হাওর অঞ্চল ও চা বাগানের ক্ষেত্রে এই কারণটি বেশি দেখা গেছে। তাছাড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনেক অভিভাবকই সন্তানদের কখন বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়, সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন না। সরকার যদিও নিয়ম করেছে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে যখনই অভিভাবক সন্তানকে বিদ্যালয়ে নিয়ে যাবে, বিদ্যালয় তাকে তখনই ভর্তি করাতে বাধ্য; কিন্তু কিছুকাল পূর্বেও এই নিয়ম ছিল না। তাছাড়া অনেক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যেমন দলিত শ্রেণির প্রতিনিধি কিংবা যৌনকর্মীর সন্তানদের ক্ষেত্রে সামাজিক মেলামেশার একটি অলিখিত বিধিনিষেধ থাকে, যেটিকে উপেক্ষা করে তারা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শিশু একটু বড়ো হলেই তাকে নানা কাজে লাগানো হয়। বিশেষত মেয়েশিশুরা একটু বড়ো হলে তাদের বাড়ির নানা কাজে যুক্ত করে দেয়া হয়, যা তাদের শিক্ষাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হওয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মেয়েশিশুদের যতটুকু অংশগ্রহণ আছে, মাধ্যমিক স্তরে তা-ও কম। মাধ্যমিক স্তরে মেয়েশিশুদের শিক্ষা একপ্রকার উপেক্ষিতই বলা চলে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার এই সমস্যাগুলো সরকার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অজানা নয়। এই সমস্যাগুলো দূর করার জন্য নানা সময়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সমস্যার প্রকোপ কমছে না। না-কমার একটি বড়ো কারণ হচ্ছে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষরা সারা দেশে নানাভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এবং তাদের জন্য যে অ্যাপ্রোচে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা, সেটির অভাব রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুরা বিশেষত মেয়েশিশুরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো মাথায় রেখে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কিছু সুপারিশ বিবেচনা করা যেতে পারে।

১. যেহেতু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনেক শিশু অর্থাভাবে লেখাপড়া করতে পারে না এবং একই কারণে তাদের কম বয়স থেকেই জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করতে হয়, সুতরাং তাদের জন্য আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে, যেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষত মেয়েশিশুরা মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত একেবারে বিনাবেতনে এবং উপবৃত্তি নিয়ে পড়ালেখা করতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষা কোর্স পাস করার পর মেধার ভিত্তিতে এসব শিক্ষার্থীকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষায় প্রাধান্য দেয়া সরকারের অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্তব্য হওয়া উচিত।

২. সব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে একইভাবে বিবেচনা না-করে একেক গোষ্ঠীর জন্য একেকভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। পরিকল্পনা গ্রহণের আগে গবেষণা ও আনুষঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য তাদের চাহিদা এবং সামাজিক ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন।

৩. বিদ্যালয় স্থাপন বা অন্যান্য পড়ালেখাসংক্রান্ত বিষয়াদির জন্য সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মকানুন রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সেসব নিয়মকানুন শিথিল করা দরকার এবং অবস্থাভেদে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ যে পরিমাণ ঘনবসতি থাকলে একটি সমতল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার নিয়ম রয়েছে, সেই নিয়ম পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা কিংবা হাওর এলাকায় প্রযোজ্য হতে পারে না। এরকম বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা দরকার এবং সে অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের অবস্থান এলাকাভিত্তিক হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা সারা দেশেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে (যেমন বস্তির শিশু, দলিত শিশু ইত্যাদি)। তারা যেন তাদের এলাকার

[14] Roy G (2011). *State of early childhood care and Development (ECCD) and primary education in Plan intervention areas.* Dhaka: Plan Bangladesh.

বিদ্যালয়গুলোতে যথাযথভাবে যেতে পারে এবং কোনো প্রকার বিধিনিষেধের সম্মুখীন না-হয়, সেজন্য সরকারিভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্যও প্রচারণা চালানোর প্রয়োজন রয়েছে।

৫. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ যেসব এলাকায় বসবাস করেন, সেসব এলাকার সাধারণ মানুষদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার বিষয়ে সচেতন করা দরকার। এক্ষেত্রে কমিউনিটির মানুষ, স্থানীয় এনজিও ও স্থানীয় সরকারের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। বর্তমানে অনেক এনজিও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে। তাদের সাথে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বাড়ানো দরকার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যেন যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, তা নিশ্চিত করা দরকার।

৬. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের নিয়ে কোনো ধরনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের আগে সরকারের নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে তাদের সাথে তাদের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সংলাপ করা দরকার। যাদের ঘিরে উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হবে, তাদের এই প্রক্রিয়ার সাথে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করা দরকার এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সে অনুসারে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৭. সর্বোপরি, বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কারা কী কারণে পিছিয়ে রয়েছে, সেটি ভালোভাবে চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ ও অন্যান্য অগ্রাধিকার ঠিক করা উচিত।

গৌতম রায় গবেষণা সমন্বয়ক, প্ল্যান বাংলাদেশ, ঢাকা। gtmroy@gmail.com